সরস্বতীর ইতর সন্তানের প্রেসিডেন্সি–পর্ব

সুমিত চৌধুরী

আমাদের কলেজে ঢোকা আশির দশকের এক্কেবারে গোড়ায়। এক্কেবারে অন্য ব্র্যান্ডের ক্রান্তিকাল ছিল সেটা। শহর কলকাতা থেকে সত্তর দশকের বারুদের ঘ্রাণ ফিকে হয়ে এসেছে। সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করতে গিয়ে ফিজিক্সের প্রবীর রায় চৌধুরীর মতো যারা লাশকাটা ঘরে চালান হয়ে গেছে অথবা কলেজেরই প্রাক্তনী অসীম চ্যাটার্জী, রতন খাসনবিশের মতো যারা জীবনের বেশ কটা মুল্যবান বছর কারাগারের অন্ধকারে ফেলে রেখে সাতাত্তর–আটাত্তরের ঢালাও বন্দি মুক্তির সুযোগে বাইরে এসেছেন, তাদের কথা–টথাও ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ একটা আলোচনা হয় না। তবে নকশালপন্থীদের শহুরে ব্যক্তিত্বদের কেউ কেউ "মূলধারার" জীবন যাপনে ফিরে এসে নিজ নিজ কেরামতিতে তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন। কেউ কেউ আবার রীতিমত প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার প্রতিষ্ঠানই প্রায় বানিয়ে ফেলেছেন। গৌতম ভদ্র দক্ষিণ কলকাতায় রাতের অন্ধকারে ঘরে ঘরে সি পি আই এম এলের মুখপত্র 'দেশব্রতী' বিলি করবার দায় থেকে মুক্তি পেয়ে কয়েকজন সমগোত্রীয় সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে ইতিহাসে সাব–অলটার্ন স্টাডিজের ভিত গড়বার কাজে পুরোদমে নেমে পড়েছেন। তিনি একদিন রণজিৎ গুহকে সঙ্গে নিয়ে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার আঙ্গিকের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই বোধহয় পি.এল.টি. বা অন্য কোনো লেকচার থিয়েটারের বদলে কলেজ ক্যান্টিনেই স্টাডি ক্লাস নিয়ে গেলেন। বলা বাহুল্য তখনো ক্যান্টিনের কাণ্ডারি প্রমোদদা। অন্য কোনো খাবারের আউটলেট তখন অবশ্য ছিলও না কলেজ চত্বরে।

কিন্তু এই সব লাফালাফির মধ্যেও বোঝা যাচ্ছিল শহরের মধ্যবিত্ত নতুন চেহারায় উঠে আসছে। দেখা যাচ্ছিল, যে প্রেসিডেন্সি কলেজ র‍্যাডিকাল মুভমেন্টের সূতিকাগার হিসেবে চিহ্নিত ছিল, যে প্রেসিডেন্সি কলেজকে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে একদা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কে.সি.পন্থ নকশাল আন্দোলনের মূল ক্যানসার স্পট হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, সেই প্রেসিডেন্সি কলেজে জেলার ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার অনুপাত কমছে। কমছে বাংলা মাধ্যম থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার অনুপাত। ইংরাজি মাধ্যমে পড়ে আসা ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার অনুপাত বাড়ছে। সব মিলিয়ে গোটা ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের নগরকেন্দ্রগুলিতেও যে নয়া মধ্যবিত্ত গড়ে উঠেছিল, যারা সত্তরের সমাজ বদলানোর স্বপ্নের শরিক না হয়ে আগামী দিনে ক্রেতাশাসিত সমাজের সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিতে তৎপর হয়ে উঠেছিল, তাদেরই শারীরিক উপস্থিতি, ভাবনা চিন্তা, মননের স্বাভাবিক প্রতিফলন ঘটতে শুরু করেছিল প্রেসিডেন্সির অঙ্গনে। ফলে পঞ্চাশের দশকের পর 'অরাজনীতি'র রাজনীতি পায়ের নিচে মাটি পাচ্ছিল প্রেসিডেন্সি ক্যাম্পাস পলিটিক্সে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল প্রেসিডেন্সির মতো র‍্যাডিকাল স্টুডেন্টস পলিটিক্সের হট স্পটে "Independent Block" নামে একটি অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন গজিয়ে উঠল। শুধু তাই নয় আমরা যে বছর কলেজে ঢুকি সেই ১৯৮২র ছাত্র সংসদের সাধারণ নির্বাচনে "Independent Block" একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেল। তাদের ঠেকাতে সি.পি.এমের এস.এফ.আই. এবং বিনোদ মিশ্রপন্থী নকশাল গোষ্ঠীর ছাত্রসংগঠন ABSA (যাদের উত্তরসূরি AISA দিল্লির JNU পরপর কয়েকবছর ছাত্রসংসদ জিতেছে) নির্বাচন উত্তর সমঝোতায় গিয়ে মিলিজুলি ছাত্রসংসদ গঠনে বাধ্য হল। কিন্তু অরাজনীতি ঠেকানো গেল না। পরের বছর সেই "Independent Block" নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এল।

সত্তরের দশকে শহরকেন্দ্রগুলিতে যে মধ্যবিত্তের রাগী কণ্ঠস্বরের মধ্যে voice of decent প্রতিধ্বনিত হত, আশির দশকে উদীয়মান নয়া মধ্যবিত্তের অবস্থান হল তার থেকে বহু দূরে। আমরা যারা তখনো নকশালবাড়ি বসন্তের বজ্রনির্ঘোষের অনুরণনের অবশেষ শোনবার আশায় ইতি–উতি কান পাততাম, তারা খুব দ্রুত বুঝতে পারছিলাম, হাওয়া অন্যদিকে বইছে। তবে অরাজনীতির হাওয়ার দাপটে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষিণ পন্থাও যে খুব একটা সুবিধা করতে পারছিল তা নয়। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্র এবং রাজ্যে কংগ্রেস পরাজিত হলে ছাত্রপরিষদ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সরে যাওয়ার পর কখনোই আর সেভাবে পায়ের নিচে জমি ফেরৎ পায়নি। অধুনা টি ভি র চ্যাট–শোর দৌলতে বিখ্যাত হয়ে যাওয়া অরুণাভ ঘোষই বলতে গেলে প্রেসিডেন্সির দক্ষিণপন্থী রাজনীতির লাস্ট মাহিকান। ১৯৮৬–৮৭ সাল নাগাদ রাজীব গান্ধী যখন কংগ্রেসের সর্বেসর্বা, প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী বিভাস চৌধুরীকে ছাত্রপরিষদের রাজ্য সভাপতি করেছিলেন। সেই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রপরিষদের ইউনিট পুনর্গঠিত করবার একটা চেষ্টা হয়, কিন্তু সাফল্য পায়নি।

যাই হোক, প্রেসিডেন্সির ক্যাম্পাস পলিটিক্সে অরাজনীতির হাওয়ায় একটা

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

প্রো-এসটাবলিসমেন্ট ঝোঁক স্পষ্ট হচ্ছিল। যদিও সেটা প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষিণ পন্থা রূপে প্রকট ছিল না। এই সময় রাজ্য রাজনীতিতে একটা চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটছিল। ১৯৮০-তে ইন্দিরা গান্ধী যখন ক্ষমতায় এলেন তখন অনেকে মনে করছিলেন বামফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে সেরকম কিছু ঘটলো না। বরং ১৯৮২-তে জ্যোতিবাবুরা ফের ক্ষমতায় এলেন। তখন থেকেই ভুয়োদর্শীরা বুঝে গেলেন, এবার যুক্তফ্রন্টের কহানির রিপিট টেলিকাস্ট হচ্ছে না। রাজ্যে সরকারি বামপন্থার প্রাতিষ্ঠানিক রুপটি ক্রমশ স্পষ্ট হতে শুরু করল। ১৯৮৩ তে সি.পি.এমের ক্যাডাররা ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনকারীদের, যার মধ্যে এস.ইউ.সি র মহিলা কর্মীরাও ছিলেন, রাস্তায় ফেলে লাঠিপেটা করলো। কলেজস্ট্রিটেই একাধিক ঘটনা ঘটল। সব মিলিয়ে ক্যাম্পাসে অরাজনীতির হাওয়া আরো জোরালো হল। যার পরিণতিতে ১৯৮৩ সালের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে Independent Block নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এল। আমরা যারা বিকল্প বামপন্থার কথা বলতাম তারা বহু কাঠখড় পুড়িয়ে ১৯৮৫ তে ‘‘প্রেসিডেন্সি কলেজ স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের’’ ব্যানারে ছাত্রসংসদ দখল করলাম। ইতিহাসের অবিকৃত ধারাবিবরণীর খাতিরে এখানে উল্লেখ করে রাখা দরকার সঠিক ভাবে বললে আমরা PCSA পুনর্গঠিত করেছিলাম। কারণ ১৯৭৫ সালে ইমার্জেন্সি জারি হওয়ার আগে কংগ্রেসের রাজনীতির বিরুদ্ধে বৃহত্তর লড়াইয়ের মঞ্চ হিসেবে PCAS গড়ে উঠেছিল। সেই PCAS তে অবশ্য নকশালপন্থীরা ছাড়াও সি.পি.এম. ও এস.ইউ.সি র সমর্থকরাও ছিল। জরুরি অবস্থায় কংগ্রেসিদের দাপটে PCAS উঠে যায়। তপন চট্টোপাধ্যায়, সন্ময়দা বা সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়ের মতো দু-একজন কট্টর নকশাল পন্থী ছাত্র মাটি কামড়ে কোনোমতে ক্যাম্পাসে কংগ্রেস বিরোধিতা চালিয়ে গিয়েছিল। ১৯৮৫ তে আমরা PCSA পুনর্গঠিত করেছিলাম অরাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে সমাজমুখী মননশীল ছাত্রছাত্রীদের এক বৃহত্তর মঞ্চ হিসেবে। এই কাজ করতে গিয়ে আমাদের পৃথিবীর বৃহত্তর পাঠশালায় কিছু Extra Class করা হয়ে গিয়েছিল। কখনো ধর্মঘটরত জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে কলকাতার রাজপথে প্যারলাল আউটডোর চালিয়েছি, কখনো ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পর ত্রাণ নিয়ে আমাদের ছেলেরা ভোপাল পাড়ি দিয়েছে। কখনো ইউনিয়ন রুমে আমাদের এবং অন্য কলেজের অশিক্ষক কর্মীদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে নাইট ক্লাস চলেছে।

একথা ঠিক ফিজিক্সের নবকুমার বিশ্বাসের মতো দু-একজনের কথা বাদ দিলে আমাদের সমসাময়িক সতীর্থদের মধ্যে কেউই বিপ্লবী রাজনীতির হোলটাইমার হতে যাইনি। আমি যতদূর খোঁজ রাখি এস.ইউ.সির দু একজন এখনো পার্টির হোলটাইমার। আর আশির দশকে প্রেসিডেন্সি কলেজে এস.এফ.আই এর খুব খারাপ সময়েও প্রবল বিক্রমে যে এস.এফ.আই এর পতাকা প্রাণপনে উড়িয়ে রেখেছিল সেই দেবাশীষ চক্রবর্তী এখন সি.পি.এমের রাজ্য কমিটির মেম্বার। গণশক্তির সহ সম্পাদক ও হয়েছে বোধহয়। তবু অন্যতর এই extra curricular activities এর দৌলতে জীবনের বিভিন্ন দিক দেখবার সুযোগ হয়েছিল। একটা অন্য ঘরানার জীবনবোধ তৈরি হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। নশ্বর এই জীবনে সেটা আমার এক পরম প্রাপ্তি।

প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি নির্দিষ্ট পর্বে নিত্যবিত্ত অতীতের এই কথামালায় রাজনীতির বাইরে অন্যান্য বহু চরিত্রও উল্লেখের দাবি রাখে। আমাদের সময়ে প্রেসিডেন্সির ‘বিশ্ববিদ্যালয়’এর তকমা না থাকলেও ফিজিক্সের এ.কে.আর, ইংরেজিতে সুকান্ত চৌধুরী বা জিওলজিতে ডঃ সাহার মতো মিনার প্রতিম ব্যাক্তিত্বের শিক্ষকেরা পড়াতেন। কিন্তু শিক্ষক শিক্ষিকা-মণ্ডলীর বাইরে কলেজের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে অনেক বর্ণময় চরিত্র ছিল। কলেজের দ্বাররক্ষী ‘‘জনি’’ বা ‘‘রামদেও’’ এর কথা পুরোনো ছাত্রদের অনেকের মনে থাকবে। জনির জ্যাঠা প্রেসিডেন্সি কলেজে দাঙ্গাকারীদের হামলা ঠেকাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। তিনিও দ্বাররক্ষী ছিলেন। এখনো দ্বাররক্ষীর ঘরের সামনে একটি স্মৃতি ফলকে সে কথা লেখা আছে। পক্ককেশ জনি পুরনো কোনো ছাত্র চাকরি পেয়েছে শুনলেই দেখা হওয়া মাত্র বলতে শুরু করতো ‘‘খরচা কর, কিছু খরচা কর’’। আর স্টুডেন্টস সেকশনের দিলীপদার কথা সবার মনে থাকবে। সত্তরের ঝোড়ো দিনগুলিতে শুনেছি বোমাবাজিতে আহত ছাত্রীকে প্রবল গণ্ডগোলের মধ্যে একা দিলীপদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে গিয়েছেন। আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুদিন পর দিলীপদা কর্মজীবন থেকে অবসর নেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে দিলীপদার জন্য বেকার হলে বিদায় সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছিলাম। এখন যে প্রীতমের মুম্বাইতে সুরকার হিসেবে বিস্তর নাম ডাক হয়েছে সেই প্রীতম গিটার বা সিন্থেসাইজার জাতীয় একটা কিছু নিয়ে গেয়েছিল ‘‘ চল-তে চল-তে মেরে ইয়ে গীত ইয়াদ রাখ না...’’। আমি জানি না প্রেসিডেন্সির কোনো স্বনামধন্য শিক্ষকের জন্যেও বেকার হলে বিদায় সম্বর্ধনা হয়েছে কিনা! আর একটা চরিত্র হচ্ছে ক্যান্টিনের সর্বজনীন প্রমোদ-দা। প্রাক্তনীরা সকলেই জানেন প্রেসিডেন্সিতে আগে এত কাফে-টাফে ছিল না। সবেধন নীলমণি প্রমোদদার ক্যান্টিন ছিল যাবতীয় আড্ডার ঠেক। এই ক্যান্টিন আগে প্রমোদদার জ্যাঠা চালাতেন। তারপর চালাতো প্রমোদের দাদা প্রবোধ। শেষে এখন

> *‘‘১৯৮৫ তে আমরা PCSA পুর্ণগঠিত করেছিলাম অরাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে সমাজমুখী মননশীল ছাত্রছাত্রীদের এক বৃহত্তর মঞ্চ হিসেবে। এই কাজ করতে গিয়ে আমাদের পৃথিবীর বৃহত্তর পাঠশালায় কিছু Extra Class করা হয়ে গিয়েছিল’’*

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

এবং এ..খ..নো.. প্রমোদ। পাঁচ দশক পেরিয়ে গল সম্ভবত। তবে প্রেসিডেন্সির ক্যান্টিনের বংশানুক্রমিক মালিকানার বোধহয় এখানেই ইতি। প্রমোদের ছেলে এখন দাক্ষিনাত্যে সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার। এখনকার ছেলেমেয়েদের পক্ষে কল্পনা করা মুশকিল প্রমোদের ক্যান্টিনে আশির দশকের শুরুতেও ফ্রিজ ছিল না। শেষে নাচার হয়ে প্রমোদ বললে, একটা কাজ করি। কলকাতায় প্রচুর উৎকলবাসী রয়েছে। কিন্তু উড়িয়া ফিল্ম দেখানোর ব্যাবস্থা নেই। চলো আমরা উড়িয়া ফিল্ম দেখিয়ে ফ্রিজের টাকা তোলার ব্যবস্থা করি। প্রমোদ একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ দরদাম ও করে ফেললো। ভুবনেশ্বর বা কটক কোনো একটা জায়গা থেকে ছবি আনার ব্যবস্থা হল। ছবির নাম ছিল ‘‘জগা মগরে পগা’’। প্রমোদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে কলকাতায় উৎকলবাসীদের বসতের সামাজিক মানচিত্র সম্পর্কে জ্ঞান ক্রমশ বাড়ল। একদিন সন্ধ্যায় প্রমোদ বললে, চলো পোস্টার ছাপা হয়ে গিয়েছে, গিয়ে নিয়ে আসি। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বৌবাজারের কাছাকাছি গিয়ে দেখি প্রমোদ সেই বিখ্যাত নিষিদ্ধ পল্লীর গলিতে ঢুকছে। ভরসন্ধ্যায় গলির মোড় থেকেই প্রায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে। আমি বললাম, আরে ও প্রমোদ, কোথায় চললে? প্রমোদ বললো, কেন? এই গলিতেই তো উড়িয়া প্রেস। জেনেছিলাম ডানলপ, বেলঘরিয়ার মতো হাড়কাটা গলিও কলকাতার উৎকলিদের একটা বড়ো আড্ডা। অনেক বাড়ির দোতলা তিনতলায় গণিকারা থাকলেও একতলায় বা সিঁড়ি ঘরের ঘুপচি কোণায় ফোঁটা লাগিয়ে মন্ত্র পড়ে যাওয়া উৎকলিদের বাস। প্রেসিডেন্সির ক্যান্টিনের প্রথম ফ্রিজ উৎকলি ছবি ‘‘জগা মগরে পগা’’ দেখিয়ে কেনা। ভারতীয় চলচিত্রের ইতিহাসে এ তথ্য স্থান পাবে কিনা তা অবশ্য জানি না।

সরস্বতীর এই ইতর সন্তানের প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢোকাই সার হয়েছিল। পড়াশোনা করা বিশেষ হয়ে ওঠেনি। ক্লাস ঘরের ঘণ্টা তার নিজস্ব ছন্দে বেজে গিয়েছে। আমার অধিকাংশ সময় কেটেছে ওই এক্সট্রা ক্লাসে। কোনো ক্ষেত্রে কোনো সাফল্যের ধারে কাছে না থেকেও কলেজ জীবনে ফেলে আসা ওই দিনগুলো এখোনো আমার কাছে এক আশ্চর্য মায়ামুকুর।

প্রাক্তনী (রাষ্ট্রবিজ্ঞান/ ১৯৮২–৮৫)

ফ্রিলান্স সাংবাদিক, কলকাতা

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073